# রহস্য হিরের দুল

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| রাত ভয়ংকর | ৯ |
| ওরা পৃথিবীর মঙ্গল চায় | ১৮ |
| অচেনা অতিথি | ৩৪ |
| পাখির মা | ৪০ |
| ফুটপাতের হিরো | ৪৩ |
| প্রধান অতিথি | ৫৫ |
| লেখক | ৬২ |
| ফাঁসি-রহস্য | ৭৮ |
| মামা-ভাগনি গোয়েন্দা সংস্থা | ৮৩ |
| কালু ফিরে এল | ৯৪ |
| হামান-দিস্তা নিখোঁজ | ১০৬ |
| সর্ষের মধ্যে | ১২১ |
| সূত্র যখন সিঙাড়া | ১৩৩ |
| রহস্য হিরের দুল | ১৪৭ |
| যে হতে চেয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় | ১৬৭ |

# রাত ভয়ংকর

মসৃণ পিচরাস্তা ধরে গাড়ি ছুটছে। পেছনের সিটে আমি আর সুবেশ। আমরা যাব কিশোরপুর। জেলাশহর থেকে ঘণ্টাখানেক আগে গাড়িতে বেরিয়েছি। গন্তব্যে পৌঁছতে এখনও কতক্ষণ লাগবে কে জানে।

সুবেশ জিগ্যেস করল, — ড্রাইভার সাহেব, কিশোরপুর পৌঁছতে এখনও কতটা যেতে হবে?

চালক বোধহয় স্বভাবে কিঞ্চিৎ গম্ভীর। কম কথার মানুষ। বয়স্ক। গাড়ি চালানো শুরু করা থেকে আমাদের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। এবারও উত্তর এল সংক্ষেপে, — এখনও ঘণ্টাখানেক।

রাস্তাটা অবশ্য বেশ ভালো। দুপাশে বনবিভাগের সংরক্ষিত অরণ্য। বেশিরভাগটাই শালজঙ্গল।

কিশোরপুর নামের ওই জায়গাতে যাওয়ার পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত আমাদের নয়। আমার দাদার। তিনি এই জেলাতে সরকারি চাকরি করেন। পূর্ত দপ্তরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আমি আর আমার বন্ধু সুবেশ দাদার কাছে বেড়াতে এসেছি। দাদাকে জিগ্যেস করেছিলাম যে, জেলাতে দ্রষ্টব্য কী-কী আছে। তাতে দাদা কয়েকটা জায়গার নাম করেছিলেন যেখানে টুরিস্টরা যেতে পছন্দ করে। সুবেশ আবার একটু-আধটু কবিতা-টবিতা লেখে। তার পছন্দ এমন কোনও জায়গায় যাওয়া, যেখানে একটা ছোট এবং শান্ত নদী আছে। নির্জনতা আছে। এবং রাত কাটাবার জন্য একটা ছিমছাম বাংলো আছে। যেখানে সচরাচর মানুষ খুব একটা যেতে পছন্দ করে না। কিন্তু একবার গেলে জায়গাটাকে হয়তো ভালবেসে ফেলা যায়।

সুবেশের পছন্দের কথা জেনে দাদা বলেছিলেন,— একটা জায়গায় তোমরা যেতে পারো— কিশোরপুর। ওখানে আমাদের দপ্তরের একটা বাংলো আছে।

ওখানে আর কী-কী দেখার আছে দাদা?— সুবেশের প্রশ্ন।

— দেখার তেমন কিছু নেই। তবে তুমি যেমন চাইছ, একটা নদী অবশ্য আছে। নদীতে জলও থাকে বেশ। আর ঠিক নদীর ধারেই আমাদের দোতলা বাংলো। নির্জনতা যদি চাও তাহলে ওখানে এক রাতের জন্য অন্তত যেতে পারো।

আমরা দুজনেই একমত হয়েছিলাম কিশোরপুরেই যাব।

আমার দাদা উঁচু পদে চাকরি করেন। তিনি আমাদের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর কিশোরপুরের বাংলোর চৌকিদারকেও খবর পাঠিয়েছেন। আমাদের থাকার জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

ঠিক দু-ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কিশোরপুর এসে পৌঁছলাম। দূর থেকে হলুদ দোতলা বাংলো দেখে ভালোই লাগল। গেট বন্ধ ছিল। গাড়ির হর্ন শুনে হন্তদন্ত হয়ে মাঝবয়সি

চৌকিদার এসে হাজির। বাংলোর গেট খুলে দিল। তারপর সেলাম ঠুকল আমাদের। সামনে মোরাম ছড়ানো রাস্তা। গাড়ি যখন ঢুকল, সেই রাস্তায় সরসর-সরসর আওয়াজ। ছিমছাম দোতলা বাংলো। আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে। সরকারি বাংলো একটা নির্দিষ্ট ধাঁচের। কিংবা ছাঁচের। সেই ধাঁচ কিংবা ছাঁচ এখানেও। দোতলাতে পাশাপাশি দুটো ঘর। তার মধ্যে একটা ঘরে আমাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা। এই ধরনের ঘরকে আসলে সুইট বলে। প্রথমে ঢুকেই ড্রয়িং-রুমের মতন। তারপর শোওয়ার ঘর। সারা রুমেই পুরু কার্পেট। শীততাপনিয়ন্ত্রিত। ঠাণ্ডা মেশিন চালানোই ছিল। এখন গরমকাল। তাই ঢুকতেই আরামের অনুভব। ড্রয়িং-রুম কিংবা পার্লারে দামি সোফা। তার একটাতে ধপ করে বসে বললাম, — বাংলোটা কিন্তু চমৎকার! কী বলো সুবেশ?

সুবেশ ততক্ষণে শোওয়ার ঘর পেরিয়ে ওপাশের দরজা খুলে ব্যালকনিতে চলে গেছে। সেখান থেকেই সে বিস্ময়ের গলায় বলল,— বাহ! চমৎকার! এ যে একেবারে স্বর্গীয় দৃশ্য! এসো— অরিন্দম দেখে যাও। চোখদুটো জুড়িয়ে যাবে।

ব্যালকনিতে ছুটে গেলাম। সত্যিই অপূর্ব দৃশ্য! আমরা কলকাতার মানুষ। প্রকৃতির রূপ দেখতে ছুটি কত নামী জায়গাতে। সেসব জায়গা পর্যটকদের ভিড়ে ভর্তি থাকে। প্রকৃতির নিজস্ব রূপকে মানুষ আরও নানা পদ্ধতিতে নিজের মতন সাজিয়ে রাখে। কিন্তু এখানে, কলকাতা শহর থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে যে প্রকৃতি চুপচাপ নিজের মধ্যে নিজেই বুঁদ হয়ে আছে, তার রূপের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অদূরে পাশাপাশি কয়েকটা টিলা। সেই টিলাগুলোর গা-গতর সবুজ এবং ঘন বনানীতে

ঢাকা। আর সামনেই এক নদী, সেই নদী হয়তো তেমন প্রশস্ত নয়। বলা যায় শীর্ণকায়। কিন্তু চারদিক জুড়ে এত নির্জনতা যে সেই অখ্যাত, হয়তো বা অনামা নদীর ঝিরঝির বয়ে যাওয়ার শব্দ আমাদের কানে আসছিল।

আজ দাদার বাড়ি থেকে গাড়িতে বেরিয়েছিলাম দুপুর তিনটে নাগাদ। এখানে যখন পৌঁছেছি, বিকেল পাঁচটা পেরিয়ে গেছে। চৌকিদার চা দিয়ে গেছে। গাড়ির চালকের থাকার ব্যবস্থা করেছে সে এই চত্বরের মধ্যেই অন্য এক জায়গায়। বিকেলের আলো কমে আসছে ক্রমশ। টিলার আড়ালে ডুবে যাচ্ছে ফিকে হয়ে আসা বিশাল কমলালেবু। আমরা তেমন কোনও কথা বলছি না। শুধু চুপচাপ উপভোগ করছি চারপাশের শান্ত নির্জনতা। আর কানে আসছে— ঝিরঝির-ঝিরঝির। সেই কৃশ নদীর আপনমনে চলার ছন্দ।

তারপর একসময় কখন যেন ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল। আমরা চলে এলাম ঘরে।

ইতিমধ্যে চৌকিদার টাকা নিয়ে গেছে। আমাদের তিনজনকে সে রান্না করে খাওয়াবে। এখানে নাকি দিশি মুরগি পাওয়া যায়। চৌকিদার জানিয়েছে তার স্বাদই আলাদা। সে বাজারে চলে গেছে।

আমরা দুজনে মুখোমুখি। গল্পের সুতো খুলেছি। কতরকম গল্প....।

হঠাৎ সুবেশ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল,— ওই ছবিটা দেখো অরিন্দম?

আমি ঘাড় ঘোরালাম। ছবিটা এতক্ষণ তেমন নজর করিনি। সুবেশের কথায় ভালোভাবে দেখলাম। ঘরে জোরালো আলো। এই বিছানাতে বসেই বেশ দেখতে পাচ্ছি। সাপের ছবি। একটা সাপ ফণা তুলে.....।

মনে হচ্ছে ছবিটা একটা পেনসিল স্কেচ। — সুবেশ বলল। তারপর বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালে আটকানো ওই ছবিটার সামনে। খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল ছবিটা।

হঠাৎ ওই ছবিটা নিয়ে পড়লে কেন?— আমি বললাম, সরকারি বাংলোতে ওরকম অনেক ছবি কিংবা ফটো ঝোলানো থাকে। বাঘ, হাতি, সাপ কিংবা পাখির ছবি। কিংবা জেলার কোনও বিশেষ পর্যটন কেন্দ্রের ছবি....।

— ছবিটা কিন্তু খুব লিভিং। দেখবে এসো অরিন্দম।

খুব একটা আগ্রহ পাচ্ছিলাম না। তবুও সুবেশের অনুরোধে উঠে গেলাম।

কার আঁকা বলো তো ছবিটা?— সুবেশ জিগ্যেস করল।

— পেইন্টিং এর নিচে কোণে দিকে শিল্পীর নামের আর পদবির আদ্যক্ষর দেওয়া থাকে। এখানে সেরকম কিছু নেই?

— আছে অবশ্য। জে. আর.। কে হতে পারে বলো তো?

—দূর, বাদ দাও। .... এখানকার লোকাল কোনও আর্টিস্ট হয়তো। .... না ভাই, জে আর নামের আদক্ষর এরকম কোনও আর্টিস্ট আমার জানা নেই। জে.সি. হলে বলতাম যোগেন চৌধুরী।

যোগেন চৌধুরীর ছবির ধরন আলাদা।— সুবেশ বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, কোনও লোকাল আর্টিস্ট....।

— কিন্তু সামান্য এই পেনসিল-স্কেচটা কী এমন যে তুমি এত গবেষণা শুরু করে দিয়েছ?

— একটু ভালোভাবে দেখো ছবিটা। স্কেচটা কিন্তু অপূর্ব! একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে আছে। চোখদুটো দেখছো? খুব লিভিং!

— শঙ্খচূড় সাপ, সেটা বুঝলে কীভাবে?

— দেখে মনে হচ্ছে। মাটি থেকে সটান এত লম্বা ফণা আর কোন সাপের হবে? জিম করবেটের লেখায় পড়নি? কিং কোবরা মানে শঙ্খচূড়। সাপের রাজা। মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচু হতে পারে তার ফণা....।

— তো তুমি হঠাৎ এই সামান্য একটা পেনসিল-স্কেচ দেখে সাপ নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন? রাত হয়ে আসছে। একটু বাদেই চৌকিদার খাওয়ার জন্য ডাকবে। দেখি তার আবার রান্নার হাত কীরকম।

কিন্তু আমার কথা সুবেশের কানে যেন ঢুকছিল না। সে তখনও ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। বরং সে আমাকে আবার বলল,— যাই বলো তুমি অরিন্দম, সাপটার চোখদুটো কিন্তু খুব লিভিং মনে হচ্ছে।

— তাই নাকি? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। ওই শোনো দরজায় ঠকঠক। নিশ্চয়ই চৌকিদার।

হ্যাঁ চৌকিদারই। আমি ঘরের ভেতরে আসতে বলায় সে দরজা ঠেলে ঢুকল। মাঝবয়সি লোকটাকে দেখে নিরীহ বলেই মনে হয়।

— স্যার রান্না হয়ে গেছে। খাবেন নাকি?

হ্যাঁ খাব। দিয়ে দাও। — আমি বললাম।

— আচ্ছা এই ছবিটা কার আঁকা বলতে পারবে ভাই— সুবেশের প্রশ্ন শুনে লোকটা দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকাল।

— বলতে পারব না স্যার। তবে ছবিটা অনেকদিনই টাঙানো আছে।

— অনেকদিন মানে?

— আমার এখানে কাজে বহাল হবার আগে থেকে —।

— তুমি কবে থেকে কাজ করছ?

— আড়াই বছর হল। খুব অসুবিধে হচ্ছে স্যার। আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে পোস্টিং। আমি বদলির দরখাস্ত করেছি। সাহেবকে বলে যদি একটু—

শেষের কথাটা চৌকিদার আমার দিকে তাকিয়ে বলল। বুঝলাম আমাদের গাড়ির চালকের মুখ থেকে সে জেনে গেছে যে আমার দাদা-ই হল তার সাহেব।

আচ্ছা দেখব।— মৃদুভাবে বললাম আমি।

লোকালয় থেকে অনেক দূরে এরকম জনমানবহীন জায়গা থেকে বদলি হবার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখতে পেয়েই হয়তো চৌকিদার আমাদের বেশ খাতির-যত্ন করছে।

লোকটার রান্নার হাতও বেশ ভালো। চিকেন যা রেঁধেছে, কলকাতার নামী হোটেলের রান্নার সঙ্গে তা পাল্লা দিতে পারে মনে হল। খেতে বসে বুঝলাম খিদেও বেশ পেয়েছিল। সুবেশও একমনে খাচ্ছে। ঠিক একমনে খাচ্ছে কি? খাচ্ছে বটে। কিন্তু যেন অন্যমনস্ক। সামান্য একটা পেনসিলে আঁকা ছবি নিয়ে যে ও কী এত চিন্তা করছে...!

এই বাংলোতে লোকজন খুব বেশি আসে?— খেতে-খেতে চৌকিদারকে জিগ্যেস করলাম।

—খুব বেশি আসে না স্যার। সেই ছ'মাস আগে আপনাদের মতন দুজন এসেছিলেন। তাঁরা অবশ্য নিচের ঘরে ছিলেন।

— দোতলার এই ঘরে শেষ কারা ছিলেন?

— আমি যতদিন আছি এই ঘরে থাকতে দেখিনি কাউকে।

কেন?— এবার সুবেশ জিগ্যেস করল।

— আপনারা যে ঘরে আছেন, এটা ভি. আই. পি. ঘর স্যার। মন্ত্রী-টন্ত্রী এলে এই ঘর দেওয়া হয়। কিন্তু আমি আড়াই বছর এখানে কাজ করছি। একদিনের জন্যেও কোনও মন্ত্রী আসেননি। এখানে কে আসবে? কেনই বা আসবে? একপেশে জায়গা...।

— তাহলে আমাদের এই ঘর দেওয়া হল কেন? — আমার প্রশ্ন।

— আপনারা তো আমাদের বড় সাহেবের গেস্ট। আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের জন্যে ভি. আই. পি. রুম খুলে দিতে। আমি তাই এই ঘরটাই খুলে দিলাম।

বেশ করেছ ভাই। — আমি বললাম। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার খেয়েছেন তো?

— হ্যাঁ স্যার। উনি খেয়েছেন। আমার ঘরের পাশেই উনি আছেন। এতক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

খাবার টেবিল পরিষ্কার করে চৌকিদার চলে গেল। আর আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ ব্যালকনিতে বসে প্রকৃতির অপার নির্জনতা উপভোগ করলাম। আকাশে ক্ষয়াটে চাঁদ। চোখের সামনে অন্ধকার। গাছে-গাছে জোনাকির পাঁতি। আর সেই নদীর বয়ে চলার শব্দ। নির্জনতা এত রাতে আরও ব্যাপক ও গভীর বলেই ঝিরঝির শব্দ স্পষ্টভাবে কানে আসছে।

— চলো শুয়ে পড়া যাক।— হাই তুলে বললাম।

— চলো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

— অরিন্দম— এই অরিন্দম—

সুবেশের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

— কী হল?